The Dhaka University Journal of Linguistics: Vol. 13, No. 25-26, Published by the Registrar, University of Dhaka, ISSN 2075-3098

গফরগাঁও উপজেলার আঞ্চলিক উপভাষা: একটি ধ্বনিতাত্ত্বিক সমীক্ষণ

আতি-উন-নাহার*

সার-সংক্ষেপ : Gafargaon upozilla is located in Mymensingh district. The means of communication of the people of this area is called Gafargaon dialect of Bengali. In grater point of view, this dialect is a part of Mymensingh dialect of Bengali. This dialect contains different types of word variation of its own. Gafargaon dialect is a different dialect in Mymensingh district for its individual phonological, morphological, and syntactical features. We all know that Mymensingh dialect has an international reputation in the various expansions of literary and cultural atmosphere. From the study of history of geographical-anthropological-historical-cultural aspects, it evident that this place is individually adorned bright features which differentiate it from other places in Bangladesh. Historical and cultural long-term circumnavigation of this dialect has build up a own lexicon treasure. The aspect of unique word treasure has made the dialect more dignified. In my paper I have tried to analyze Gafargaon dialect on the aspects of phonological feartures. To determine phonemes of this dialect I have used minimal pair selection test, contrast test and sub-minimal pair test. I have got seven oral vowels and twenty six consonant sounds in Gaffargaon dialect during this research. So the present article includes the reflections of some features of the lexicon of this dialect and phonological analysis of Gafargaon dialect, not done earlier. These entire componants are discussed in this paper from the aspects of linguistic study. To realize the unique variation, the dignity and significance of Gafargaon dialect, this research will play an important role in the linguistic field.

চাবি শব্দ: আঞ্চলিক উপভাষা, ধ্বনিতত্ত্ব, বিশ্লেষণ, ধ্বনিমূল, যৌগিক স্বরধ্বনি, ধ্বনি পরিবর্তন

১. ভূমিকা:

আপন সংস্কৃতিকে জানা সব জাতিরই একটি গভীরতম আর্তি ও আকডিক্ষার বিষয়। বাংলার লোকায়ত সাহিত্য সংস্কৃতির বিভিন্ন শাখা যেমন- গীতিকা, ছড়া, কৌতুক,

* সিনিয়র প্রভাষক, বাংলা বিভাগ, গণ বিশ্ববিদ্যালয়।

প্রবাদ-প্রবচন ও লোককাহিনী বিষয়ক বিভিন্ন প্রবন্ধ নিয়ে রচিত হয় লোকসাহিত্য। উপভাষায় সাধারণত লোকসাহিত্য রচিত হয়ে থাকে। বাংলা ভাষার রয়েছে বহু উপভাষা। বাংলাদেশে ভাষার সংখ্যা (ভাষা পরিসংখ্যান এথনোলগ, ২০২১ এর তথ্য অনুযায়ী) ৪৪টি। আর উপভাষার সংখ্যা অঞ্চলভেদে নির্দিষ্ট হয়ে থাকে। এটি ভাষা বৈচিত্র্যেরই স্বীকৃতি। একটি ভাষা সম্প্রদায়ের মধ্যে ভাষার বিভিন্ন রূপভেদ সৃষ্টি হতে পারে। অঞ্চলভেদে ভাষার এই রূপভেদকেই ভাষাবিজ্ঞানীরা নাম দিয়েছেন উপভাষা। প্রাত্যহিক জীবনে ব্যবহৃত ভাব প্রকাশের একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম উপভাষা। ভৌগোলিক ব্যবধান, সামাজিক শ্রেণিবিন্যাসগত পার্থক্যের কারণে উপভাষার সৃষ্টি হয়। ক্রোশে ক্রোশে ভাষা পরিবর্তনের বৈশিষ্ট্যই ভাষাকে উপভাষার আঞ্চলিক রূপ দান করে। উপভাষা আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যানুযায়ী চলিত ভাষার গঠিত রূপ। 'উপভাষা হচ্ছে চলিত ভাষার একটা উপরূপ, যা চলিত ভাষার চেয়ে কম ভাষাভাষীদের অঞ্চলে নিজস্ব সম্প্রদায়ের মধ্যে ব্যবহৃত হয়'(মোরশেদ, ২০০৯)।

ভাষার জন্য প্রয়োজন একটি নির্দিষ্ট ভূখণ্ড ও জনগোষ্ঠী। উপভাষার ক্ষেত্রে বিষয়টি আরও সত্য। বাংলাদেশে রয়েছে নানা উপভাষা বৈচিত্র্য। যেমন- ঢাকাই উপভাষা, ময়মনসিংহের উপভাষা, নোয়াখালী উপভাষা, বরিশালের উপভাষা, সিলেটী উপভাষা, চট্টগ্রামী বা চাঁটগাইয়া উপভাষা, রংপুরী উপভাষা প্রভৃতি। সাধারণত ভূখণ্ডের একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলের নামানুসারেই উপভাষার নামকরণ হয়ে থাকে। এছাড়াও বেশ কিছু আদিবাসীদের ভাষার নামকরণ তাদের নৃ-গোষ্ঠীর পরিচয়ের ভিত্তিতে হয়ে থাকে। তাই আমাদের উপভাষা অঞ্চলের সাংস্কৃতিক ও ঐতিহ্যিক পরিচয় জানা আবশ্যক। কেননা ভাষার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট জাতি এবং ভূমি। ভৌগোলিকভাবে একটি ভাষার সীমা নির্দিষ্ট হয়ে থাকে। সাধারণত একটি দেশের ক্ষুদ্র অঞ্চলে ব্যবহৃত ভাষাকেই উপভাষা বলে অভিমত দিয়েছেন ভাষাবিজ্ঞানীরা।

ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্গত বাংলা ভাষা। দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার একটি অংশ বাংলা ভাষা অধ্যুষিত এলাকা। চার শতকের বেশি সময় ধরে এই অঞ্চলের জনগণ বাংলা কথা বলে সংখ্যাগরিষ্ঠ হিসেবে। ব্রিটিশের অবসান থেকে বাঙালি সম্প্রদায় দুটো রাজনৈতিক বিভক্তির স্বীকার হয়। কিন্তু বাংলা ভাষী জনগণ তাদের ভাষা ত্যাগ করেনি। নব্য রাজনৈতিক বিভাজনের পরও বাংলা তার স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে উচ্চারিত হচ্ছে দু'পর্যায়েই— ভারতের একটি দাপ্তরিক ভাষা হিসেবে ও বাংলাদেশের ৯৫ ভাগ মানুষের মুখের ভাষা হিসেবে। বাংলা ভাষার বৈচিত্র্য তার উপভাষায়। ভারতবর্ষে উপভাষাচর্চার সূত্রপাত ঘটে বিদেশিদের হাতে। পাশ্চাত্যদেশে উপভাষা গবেষণা প্রারম্ভের পরপরই এই উপমহাদেশে উপভাষা জরিপের কাজ শুরু করেন আব্রাহাম জর্জ গ্রীয়ার্সন (১৮৫১-১৯৪১) ১৮৯৪ সালে। বাংলা উপভাষা চর্চার প্রাথমিক প্রয়াসে গ্রন্থটি গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচ্য। তিনি ১৯০৩ থেকে ১৯২৮ সালের মধ্যে প্রণয়ন করেন

Linguistic Survey of India। বাংলা উপভাষাচর্চা ও আলোচনার ক্ষেত্রে গ্রীয়ার্সনের উক্ত গবেষণা এ যাবৎ কালের লেখা সর্বোৎকৃষ্ট পথিকৃৎ গ্রন্থ বলে বিবেচনা করা হয়। উনিশ ও বিশ শতকের বাংলা উপভাষার নমুনা লাভের জন্য এই গ্রন্থটি অবিস্মরণীয় হয়ে থাকবে ইতিহাসে। গ্রন্থটির ৫ম খণ্ডের প্রথমভাগে তিনি বাংলা ভাষার বিভিন্ন অঞ্চলের বর্ণনামূলক ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য নিরূপণ ও তার শ্রেণিকরণ করেছেন। গ্রীয়ার্সনের শ্রেণিকরণে পূর্ববঙ্গীয় অঞ্চলে বর্তমান বাংলাদেশের ঢাকা, ময়মনসিংহ, টাঙ্গাইল, কুমিল্লা, বরিশাল, পটুয়াখালি, ফরিদপুর, যশোর, খুলনা, সিলেট, চট্টগ্রাম, নোয়াখালি প্রভৃতি মানচিত্রের অন্তর্ভুক্ত।

গ্রীয়ার্সনের শ্রেণিকরণই পরবর্তীকালে বাংলা ভাষাবিজ্ঞানীগণ অনুসরণ ও পরিমার্জন করেছেন। বাংলা উপভাষা শ্রেণিকরণে মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ (১৯৬৫) গ্রীয়ার্সনের সূত্রগুলি বিচার করে পৃথক একটি শ্রেণিকরণের আদর্শ উপস্থিত করেন। উপভাষা শ্রেণিকরণ নিয়ে আরো অনেকের অবদান রয়েছে। তাঁদের মধ্যে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, সুকুমার সেন, পরেশচন্দ্র মজুমদার, গোপাল হালদার, মুনীর চৌধুরী, নীল মাধব সেন, অনিমেষ পাল, আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ প্রমুখ ভাষাবিজ্ঞানীর নাম উল্লেখযোগ্য (মনিরুজ্জামান, ১৯৯৪)।

বাংলা ভাষা ব্যবহারের প্রায় এক হাজার বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পর উপভাষা গবেষণার পথ প্রসারিত হয়। ব্রিটিশ ভারত বিভক্তির বহু পূর্বে বিশ শতকের শুরু থেকে কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্, প্রমথ চৌধুরী, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ড. দীনেশ চন্দ্র সেন ভাষা সংরক্ষণ ও আঞ্চলিক ভাষার সংগ্রহে এগিয়ে আসেন। ভারত পাকিস্তান বিভক্তির পরে তৎকালীন পাকিস্তানে ১৯৫৫ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় বাংলা একাডেমি যা ভাষা গবেষণার সূতিকাগার বলে খ্যাত। অতঃপর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ প্রকাশ করেন আঞ্চলিক ভাষার অভিধান। স্বাধীন বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠিত হয় আরো কিছু ভাষা গবেষণা প্রতিষ্ঠান। তবে উপভাষা গবেষণার দ্বার সম্পুর্ণ উন্মুক্ত ও প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভে এখনও বহু পথ অপেক্ষমান। আজ অবধি প্রতিষ্ঠিত হয়নি কোনো উপভাষা প্রতিষ্ঠান। বাংলাদেশে উপভাষা নিয়ে গবেষণা হয়েছে বিভিন্ন ব্যক্তি বা কোনো প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে। সুকুমার সেন (১৯৭১) ও সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় (১৯৮৯) বাংলা উপভাষাকে ৬টি শ্রেণিতে বিভক্ত করেছেন তাদের ধ্বনিতত্ত্ব ও উচ্চারণ প্রক্রিয়ার উপর নির্ভর করে। বর্তমানে বাংলাদেশে অঞ্চলভেদে বহু উপভাষা বিদ্যমান। এর মধ্যে অনেক উপভাষা বিলুপ্তির পথে- যথাযথ সংরক্ষণ ও অপারগতার কারণে। সে অভিপ্রায়ে আমাদের লোকঐতিহ্য ও সংস্কৃতিকে পুনরুজ্জীবিত করার লক্ষ্যে এ প্রয়াস। বিভিন্ন ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার মত আমি এই গবেষণায় ময়মনসিংহ জেলার গফরগাঁও উপজেলার আঞ্চলিক উপভাষার বিশ্লেষণে ভাষাবৈজ্ঞানিক পদ্ধতির আশ্রয় নিয়েছি।

বর্তমান প্রবন্ধের শিরোনাম নির্ধারিত হয়েছে 'গফরগাঁও উপজেলার আঞ্চলিক উপভাষা: একটি ধ্বনিতাত্ত্বিক সমীক্ষণ'। ভাষা ও উপভাষা সংগঠনের সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য আবিষ্কার ও ধ্বনিতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ এর মূল প্রতিপাদ্য। এক্ষেত্রে ভাষাবিজ্ঞানের তুলনামূলক ও সাংগঠনিক পদ্ধতি প্রয়োগের মাধ্যমে ভাষা ও উপভাষার পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ণয় করে উপভাষার বৈচিত্র্য অনুসন্ধান, সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্য, মৌল বৈশিষ্ট্য ও প্রবণতা তুলে ধরতে সচেষ্ট হয়েছি। প্রসঙ্গত এ অঞ্চলের ভাষা, সংস্কৃতি, ঐতিহ্যের পরিচয় ও পারস্পরিক প্রভাব, ভাষা-প্রভাব, আঞ্চলিক উপভাষাতত্ত্ব ইত্যাদি বর্তমান গবেষণার একটি প্রত্যাশিত ফল হিসেবে বিবেচনাযোগ্য।

বাংলাদেশের ময়মনসিংহের আঞ্চলিক উপভাষা নিয়ে বিচ্ছিন্নভাবে কিছু কাজ হলেও গফরগাঁও উপজেলার আঞ্চলিক উপভাষার ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য নিয়ে আধুনিক দৃষ্টিতে গভীর মনোযোগ ও বিস্তারিতভাবে কোনো গবেষণা হয়নি। আর সে লক্ষ্যে গফরগাঁওয়ের আঞ্চলিক উপভাষার বৈশিষ্ট্য নিরূপণে গুরুত্বারোপ করা হয়েছে বক্ষ্যমাণ গবেষণায়।

২. গফরগাঁও উপজেলার ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির পরিচয়

বৃহত্তর ময়মনসিংহের (ময়মনসিংহ, কিশোরগঞ্জ, জামালপুর, নেত্রকোনা) উত্তরে অবস্থিত গারো পাহাড়, জয়ন্তা, খাসিয়া অসম পর্বতশ্রেণি। হিমালয়ের গঙ্গোত্রী হিমবাহ থেকে উৎপন্ন হয়ে গঙ্গা নদীর একটি শাখা ব্রহ্মপুত্র নদ ছুটে চলেছে ময়মনসিংহ শহরের ভেতর দিয়ে গফরগাঁও উপজেলার কোল ঘেঁষে। বিভিন্ন প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন, সাহিত্যকীর্তির আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি, বিদেশী পর্যটকদের ভ্রমণবৃত্তান্ত, সুদূর অতীতকাল থেকে বিভিন্ন ধর্মীয় সংস্কৃতির সহাবস্থান এবং সেই সূত্রে জনতাত্ত্বিক সংমিশ্রণে গঠিত ময়মনসিংহের বৃহত্তর আঞ্চলিক সংস্কৃতির ধারণা মানব মনিকোঠায় ঠাঁই করে নিয়েছে। ইতিহাসবিদদের মতে, প্রাচীনকাল থেকেই সভ্যতা-সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিত হয়ে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ঐতিহ্যিক, সাংস্কৃতিক ও ভৌগোলিক পরিমণ্ডল গঠনে সমর্থ হয়েছিল এই জনপদ। একটি জনপদের মানুষের সংস্কৃতি তার ভাষার অবিচ্ছেদ্য অংশ (মজুমদার, ১৯০৭)। ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির অনন্য এক ক্ষেত্র এই উন্নত জনপদ । সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক ইতিহাসের সাক্ষী এবং প্রাকৃতিক ও ঐতিহাসিক বিভিন্ন ঐতিহ্যে আকর্ষণীয় ময়মনসিংহ জেলার অন্তর্ভুক্ত ১২টি উপজেলার অন্যতম গফরগাঁও উপজেলা। ময়মনসিংহ সদরের সঙ্গে যুক্ত ও ব্রহ্মপুত্র নদের কোল ঘেঁষে গফরগাঁও উপজেলার বিস্তৃতি। স্বনামেই গফরগাঁওয়ের পরিচয় সারা দেশে বিস্তৃত। বর্তমান গবেষণায় নির্বাচিত অঞ্চল হিসেবে গফরগাঁও উপজেলার প্রাপ্ত তথ্য ব্যবহৃত হয়েছে ।

চিত্র: গফরগাঁও উপজেলার মানচিত্র

গফরগাঁওয়ের ঐতিহাসিক পটভূমি বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন রাজবংশের শাসনের ক্রমবিবর্তনের বৈশিষ্ট্যে অলঙ্কিত। গফরগাঁও বঙ্গ দেশের একটি অংশ বিধায় এখানেও আর্যদের বসতি ছিল বলে অনুমান করা যায়। চতুর্থ শতাব্দীতে রাজা সমুদ্রগুপ্ত সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি সমতট (ফরিদপুর-ঢাকা-পশ্চিম ময়মনসিংহের দক্ষিণ অংশ অর্থাৎ ব্রহ্মপুত্র নদের পশ্চিমাংশ) দখল করেন। ভাওয়ালের পাল রাজাগণ দশম শতাব্দীর প্রারম্ভ হতে একাদশ শতাব্দীর প্রথম দিক পর্যন্ত ১২১ বছর এই অঞ্চল শাসন করেন। পাল রাজাদের পরে এটি হিন্দু শাসনে আসে। বৈদিক রাজত্বকালেই শাসন কার্যের সুবিধার জন্য বঙ্গদেশকে ৫টি ভাগে ভাগ করা হয়েছিল। বঙ্গ বিভাগটি ছিল করতোয়া ও ব্রহ্মপুত্র মধ্যবর্তী ভূ-ভাগ। আমাদের আলোচ্য গফরগাঁও এলাকা সেন রাজাদের অধীনে ছিল। ১৩৯২ সালে স্বাধীন সুলতানী আমলে সুলতান গিয়াস উদ্দিন আজম শাহের রাজত্বকালে এই এলাকা মুসলিম শাসনে আসে। প্রশাসনিক শাসনকর্তা ছিলেন জানে আলম খান। তাঁর রাজধানী ছিল বর্তমান গফরগাঁও উপজেলার দিঘিরপাড় গ্রামে। সেই সময় গফর শাহ নামে একজন দরবেশ ছিলেন, তার নামানুসারে গফরগাঁও নামকরণ করা হয়। আবার কোথাও পাওয়া যায় মোঘল সেনা নায়ক গাফফার খান স্মরণে গফরগাঁও নামকরণ হয় । ঐতিহাসিক তথ্য মতে মোঘল সেনাপতি মানসিংহ ও বাংলার বারো ভুঁইয়াদের একটি সম্মুখযুদ্ধ এই গফরগাঁওয়ে সংঘটিত হয়েছিল। গফরগাঁয়ের আঞ্চলিক উপভাষা ব্যবহারকারী জনগোষ্ঠীর ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি আর সুপ্রাচীন হিন্দু ও মুসলিম ঐতিহ্য সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। একটি অঞ্চলের ভাষার সঙ্গে ভৌগোলিক, ঐতিহাসিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক বিষয়াবলির সংসক্তি থাকে। প্রাচীন জনপদ থেকে বর্তমান অবধি এ অঞ্চলের মানুষ তাদের

উপভাষার ঐতিহ্য ধরে রেখেছে। সেই গুপ্ত আমল থেকে শুরু করে পাল বংশ, সেন রাজত্ব, রাজা শশাঙ্কের প্রতাপ, ক্ষুদ্র জাতিসত্তার রাজত্ব, সাত শতাব্দীর মুসলিম শাসনের প্রভাব, বৃটিশ শাসনকাল, সর্বোপরি পাকিস্তান শাসনামল এবং স্বাধীন বাংলাদেশ-এই সবকিছু মিলিয়ে এই উপভাষা নানা রূপবৈচিত্র্য ভরপুর নিরন্তর চলমান ও পরিণামমুখী হয়ে বয়ে চলেছে।

ইতিহাস মতে, হজরত শাহজালারের আগমনের ২৫০ বছর আগে ৪৪৫ হিজরিতে হজরত শাহ মুহাম্মদ সুলতান কমর উদ্দিন রুমি বৃহত্তর ময়মনসিংহে ইসলাম প্রচার করেন। এ কারণে গফরগাঁওয়ে রচিত হয়েছে ইসলামি ঐতিহ্যের সোনালী অধ্যায়। স্বাধীন সুলতানী আমলের প্রায় ৬০০ বছরের প্রাচীন ঐতিহ্য এখানকার তেরশ্রী জামে মসজিদ। উপজেলার উস্থি ইউনিয়নে তেরশ্রী গ্রামে মসজিদটির অবস্থান। ইংরেজি ১৪০০ সালে মোঘল আমলে এটি তৈরি করা হয়। পরবর্তীকালে স্বাধীন বাংলাদেশে ১৯৮২ সালে গফরগাঁওকে মান উন্নীত থানা হিসাবে ঘোষণা করা হয় ও একই সালের ৭নভেম্বর উদ্বোধন করেন রিয়াল এডমিরাল মাহবুব আলী খান। ১৯৮৩ সালে উপজেলা কার্যক্রম চালু হয়। উত্তরে ত্রিশাল ও নান্দাইল, দক্ষিণে গাজীপুরের শ্রীপুর ও কাপাসিয়া, পূর্বে কিশোরগঞ্জের হোসেনপুর ও পাকুন্দিয়া, পশ্চিমে ভালুকা অবস্থিত। আয়তন ৪০১.১৬ বর্গ কিলোমিটার। জনসংখ্যা ৪,১৩,৪৮৮জন। শিক্ষার হার ৬৫%। পৌর এলাকার সাতটি ইউনিয়ন নিয়ে গফরগাঁও থানা গঠিত। এই উপজেলায় আরো একটি থানা আছে তার নাম পাগলা থানা। মোট ২টি থানা, ১টি পৌরসভা, ১৫টি ইউনিয়ন, ২০২টি গ্রাম নিয়ে গফরগাঁও উপজেলা গঠিত।

সংস্কৃতির সাথে রয়েছে ভাষার ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ। আঞ্চলিক ভাষা বিকশিত হয় কোন নির্দিষ্ট সাংস্কৃতিক অঞ্চলকে কেন্দ্র করে। এ এলাকার সাংস্কৃতিক অঞ্চলকে স্বতন্ত্র করেছে একদিকে যমুনা নদী অন্যদিকে হাওর অঞ্চল; অন্যদিকে ভাওয়াল গাজীপুরের বনাঞ্চল-মেঘনা-ধলেশ্বরী-শীতলক্ষ্যার রক্ষণশীল বিচ্ছিন্নতা; এই বেষ্টনীর মধ্যকার যোগাযোগ-ঘনিষ্ঠতার ঐক্য নিয়েই গড়ে ওঠেছে গফরগাঁয়ের সাংস্কৃতিক অঞ্চল। বৃহত্তর ময়মনসিংহের অন্তর্ভুক্ত হলেও এই সাংস্কৃতিক অঞ্চলের আঞ্চলিক ভাষা, প্রবাদ প্রবচন ও লোকগাঁথায় বেশকিছু বৈসাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। বিভিন্ন জাতি গোষ্ঠীর ঘনিষ্ঠ মেলামেশায় জাতি যেমন শংকর হয়ে ওঠে মানুষে মানুষে মেলামেশায় ভাষাও তেমনি শংকর হয়ে ওঠে এবং এভাবেই উপভাষার চরিত্র কখনও বিপন্ন হয়ে যায় । তবে গফরগাঁয়ের সাংস্কৃতিক অঞ্চলটি সে অর্থে অনেকটাই নিরাপদ এবং এই নিরাপত্তাই এ অঞ্চলের ভাষাকে দিয়েছে নির্দিষ্ট গতিপথ ও স্বাতন্ত্র্য। ভাষা তার স্থানিক বৈশিষ্ট্যকেই রূপদান করে থাকে। ভাষার উপর সামাজিক ও আঞ্চলিক প্রভাব নিয়ে বিখ্যাত সমাজ ভাষাবিজ্ঞানী চেম্বার্স এবং পিটার ট্রাগিল গুরুত্বপূর্ণ মতামত বিশ্লেষণ করেছেন। তাঁদের মতে এলাকাভেদে ভাষার মধ্যে বিভিন্ন পার্থক্য যেমন- স্বরগত পার্থক্য, ধ্বনির ব্যতিক্রমী উচ্চারণ প্রক্রিয়ায়, শব্দের নতুনত্বে, বাক্যের প্রয়োগেও পার্থক্য লক্ষ্য করা যায় (Chambers &Trudgill, 1998)। এই বৈশিষ্ট্যগুলিই একটি উপভাষাকে স্বতন্ত্র

বৈশিষ্ট্য মন্ডিত করে তোলে। প্রতিটি উপভাষা এভাবে তাদের নিজস্ব বৈচিত্র্য ধারণ করে বিভিন্ন স্থানে বিরাজ করছে। আমরা বিভিন্ন ঔপভাষিক অঞ্চল পরিভ্রমণকালে বা উপভাষা মানচিত্র লক্ষ করলে এই জাগতিক সত্যটি অনুধাবন করতে পারি। যদিও একটি উপভাষা থেকে অন্য উপভাষার দূরত্ব তেমন গভীর নয়, অত্যন্ত নিকটবর্তী তাদের সহাবস্থান; তা সত্ত্বেও বৈচিত্র্যের পার্থক্যে, নিজস্ব উচ্চারণ শৈলিতে, কণ্ঠস্বরের উঠানামায় ও সুরের বৈচিত্র্যে স্বরাঘাত ও স্বরক্ষেপ এর প্রয়োগে শব্দব্যবহারের কৌশল, আঞ্চলিক ভিন্ন ভিন্ন নতুন শব্দ চয়নে এবং পদগুচ্ছের প্রবাদ-প্রবচনের ব্যবহারেও তার যথাযথ প্রয়োগ একটি উপভাষা অসাধারণ ঐশ্বর্যসমৃদ্ধ হয়ে উঠে (ইয়াসমীন, ২০১০)।

ভাষার সঙ্গে জড়িত একটি জাতির রাজনৈতিক ইতিহাস। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের মাধ্যমে আমরা অর্জন করেছি রাষ্ট্রভাষা বাংলাকে। বাংলা ভাষার আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি আজ সর্বজনবিদিত। ভাষা শহিদদের আত্মত্যাগের বিনিময়ে অর্জিত হয়েছে এই রাষ্ট্রভাষা। বাঙালি জাতির সেই মহান ভাষা আন্দোলনে যাঁরা শহিদ হয়েছিলেন তাদের একজন শহিদ আব্দুল জব্বারের বাড়ি ময়মনসিংহ জেলার গফরগাঁও উপজেলায়। তাঁর স্মৃতির উদ্দেশ্যে উপজেলার পাচুঁয়া গ্রামে নির্মিত হয়েছে ভাষা শহিদ আব্দুল জব্বার স্মৃতি পাঠাগার। পল্লী কবি জসীম উদ্‌দীনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ও গবেষণার ফসল, বাংলা সাহিত্যের অমর সৃষ্টি 'নকশী কাঁথার মাঠে'র স্মৃতিচিহ্ন বিজড়িত এই উপজেলা। এই আখ্যানের কাহিনী গফরগাঁয়ের সমাজবাস্তবতার পটভূমিতে একটি সত্য ঘটনা অবলম্বনে রচিত। পল্লীকবি জমীমউদদীন ও দীনেশ চন্দ্র সেন *মৈমনসিংহ গীতিকা* সংগ্রহের কাজে যখন ময়মনসিংহে আসেন তখন পরিচয় হয়েছিল রুপাইয়ের সাথে। *নকশী কাঁথার মাঠ* (১৯২৯) ৩৭টি ভাষায় অনুদিত হয়েছে। আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন এ পল্লীজীবন গাঁথায় বাংলার গ্রামীণ জীবনের আবহ, সহজ সরল প্রাকৃতিক রূপ মূর্ত হয়ে উঠেছে। এ কাব্যের নায়ক রূপাই ও সাজুর বাড়ি ছিল এই গফরগাঁও উপজেলায়।

'আজো এই গাঁও অঝোরে চাহিয়া ওই গাঁওটির পানে নীরবে বসিয়া কোন কথা যেন কহিতেছে কানে কানে।' (পল্লী কবি জসীম উদদীন,*নকশী কাঁথার মাঠ*)

এছাড়া যাত্রাগান, গ্রামীণ কাহিনীর উপর ভিত্তি করে অনুষ্ঠিত নাটক ও যাত্রা গফরগাঁয়ের ঐতিহ্য। এখানকার বিভিন্ন অঞ্চলে প্রচলিত লোকসঙ্গীতগুলোর অন্যতম হলো বাউলগান, ভাটিয়ালী, কিস্‌সা পালা, কবিগান, কীর্তন, ঘাটুগান, জারিগান, সারিগান, মুর্শিদী, ঢপ, যাত্রা, বিয়ের গান, মেয়েলীগান, বিচ্ছেদী গান, বারমাসী, পুঁথিগান, পালকির গান, ধানকাটার গান, ধানভানার গান, হাইট্টারা গান, গাইনের গীত, বৃষ্টির গান, ধোয়া গান, শিব-গৌরীর নৃত্য গীত, গাজীর গান ইত্যাদি।এছাড়াও পুঁথিপাঠের আসর, কেচ্ছা গানের প্রাচীন ঐতিহ্য, ঘেটু গানের চর্চা, নৌকা বাইচ, বিয়ের আসরে গীত পরিবেশন এ সকল সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য এ অঞ্চলের লোকজীবনকে সমৃদ্ধ করেছে যুগে যুগে (সাত্তার, ২০০৪)।

সাহিত্যিক মান বিচারে, জনসংখ্যার ব্যবহারে, ঔপভাষিক স্বাতন্ত্র্য বিচারে গফরগাঁও অঞ্চলের গুরুত্ব অপরিসীম। বৃহত্তর অর্থে ময়মনসিংহের আঞ্চলিক উপভাষার সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ হলেও উপভাষাটি আলাদা অস্তিত্ব ও স্বীকৃতির দাবীদার। আঞ্চলিক ভাষার কোন আলাদা লিপি বা বর্ণমালা নেই। তবে বর্তমান আকাশ সংস্কৃতির যুগে পার্শ্ববর্তী দেশের ভাষার প্রভাবে মিশ্র শব্দের ব্যবহারও বেড়ে চলেছে। তা সত্ত্বেও বাংলাদেশের অন্যান্য উপভাষা থেকে উচ্চারণ ধর্মে, শব্দ ব্যবহার কৌশলে, ধ্বনি গ্রহণ ও বর্জনে, পদক্রমিক বৈশিষ্ট্য ও পদগুচ্ছ নির্মাণে তা বিশিষ্টতার পরিচয় বহন করছে।

শব্দগতভাবে কিছু ব্যতিক্রমী উদাহরণ নিচে তুলে ধরা হল:

প্রমিত বাংলা	গফরগাঁওয়ের আঞ্চলিক বাংলা
আমাদের	আঙ্গর
আসেন	আইন
আসো	আয়ো/আও
আছাড়	থেননা
কাছে	বুগলে
খান	খাইন
তোমাদের	তুঙ্গর
তোদের	তগর
ব্যথা	দুক্কু
বড়	ডাঙ্গর
ভুরি	লুন্দি

প্রভৃতি শব্দগত বৈচিত্র্যে এ উপভাষার ব্যবহার ঢাকা ও ফরিদপুর অঞ্চলের উপভাষার কাছাকাছি বলেও ধারণা করা যায়। ঢাকার নিকটতম বিভিন্ন অঞ্চলের উপভাষার বৈশিষ্ট্য বা সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায় এ উপভাষাতে। শব্দ ব্যবহার জনিত পার্থক্য নির্ণয় একটি ব্যাপক জরিপ ভিত্তিক কাজ। তবে বক্ষ্যমাণ গবেষণায় যতটা সম্ভব জরিপের মাধ্যমে সংগৃহীত আঞ্চলিক শব্দাবলির একটি তালিকা প্রস্তুত করা হয়েছে। তার সঙ্গে মান বাংলার অর্থগত, ধ্বনিগত, রূপমূলগত তুলনা করে উপভাষার বৈশিষ্ট্য আলোচনা করা হয়েছে। বাংলাদেশের উপভাষাসমূহের সাধারণ বৈশিষ্ট্য- ধ্বনিগত পরিবর্তন, এ উপভাষাকে বৈচিত্র্য দান করেছে।

বাংলাদেশের পূর্ববঙ্গীয় উপভাষার প্রধান প্রবণতা 'অপিনিহিতি'। মূল শব্দ ইপেনথিসিস। শব্দের মধ্যে বা অভ্যন্তরে কোন ধ্বনির অন্ত :সংযোজন বা প্রবেশন ঘটলে তাকে ইপেনথিসিস বলে (মনিরুজ্জামান, ১৯৯৪)। পরবর্তী স্বরধ্বনির পূর্বে উচ্চারিত হওয়ার প্রবণতাই অপিনিহিতি।

যেমন : করে->কইর‍্যা, ছেঁচে-> ছেইচ্যা, বেটে->বাইট্যা, শুনে->হুইন্যা।

দ্বিত্ব ঘটিত শব্দে অপিনিহিতি : ভাগ্য->ভাইগ্‌গ, মধ্য>মইদ্দে

নাম শব্দে অপিনিহিতি : নারিকেল->নাইরল, হারিকেন->হাইরক্যাল, বাড়ি->বাইত, ষাট->ষাইট, মামুন->মামুইন্যা।

বাক্যস্থিত শব্দে অপিনিহিতি : কিসের জন্য যাবেন?->কেল্লিগ্যা যাইবাইন?
কোথা থেকে আসছেন?-> কইত্যে আইছুইন?
বাড়ি থেকে নিয়ে আয়-> বাইত্যে লয়্যা গা।

উল্লেখ্য যে, গফরগাঁও অঞ্চলের ঐতিহাসিক, সামাজিক, রাজনৈতিক বিভিন্ন দিক নিয়ে গবেষণা হলেও এ অঞ্চলের ভাষাগত বৈচিত্র্য নিয়ে কোন গবেষণা হয়নি। বক্ষ্যমাণ গবেষণায় এ অঞ্চলে বসবাসরত জনগোষ্ঠীর ব্যবহৃত উপভাষার ধ্বনিতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ করা হয়েছে। গফরগাওঁয়ের উপভাষাগত বৈশিষ্ট্যের পরিচয় প্রদানই গবেষণার উদ্দেশ্য।

৩. গবেষণা পদ্ধতি

বর্তমান গবেষণাকর্মটি মূলত ভাষা উপাত্ত সংগ্রহ ও উপাত্ত বিশ্লেষণ এই দুটি ধাপে সম্পন্ন হয়েছে। তবে মাঠ পর্যায়ে সংগৃহীত তথ্যের উপরই বেশি নির্ভর করতে হয়েছে। এক্ষেত্রে দুটি উৎস থেকে উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে।

৪. প্রাথমিক উৎস

যা মাঠ পর্যায়ে সংগ্রহ করা হয়েছে। গফরগাঁও উপজেলায় বসবাসরত বিভিন্ন গ্রাম ও ইউনিয়নের স্থায়ী বাসিন্দাদের নিকট থেকে তথ্য সংগ্রহ করার ব্যাপারে গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। ৪০ বছরের অধিক বয়সী নারী ও পুরুষের নিকট থেকে সরাসরি সাক্ষাৎকার ও প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে তথ্য রেকর্ড করে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। ভাষা উপাত্ত সংগ্রহে গুণগত এবং সংখ্যাগত উভয় পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে সাক্ষাৎকারের মাধ্যেমে গবেষণাপত্রের আলোকে। এ লক্ষ্যে প্রথমে প্রশ্নপত্র তৈরি করে সে অনুযায়ী সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছে। যে পদ্ধতিতে উপাত্ত সংগ্রহ, সাক্ষাৎকার, পর্যবেক্ষণ এবং নথি বিশ্লেষণ করা হয়, তাকে বলা হয় গুণগত পদ্ধতি। এতে সঠিক এবং নির্ভুল উপাত্ত সংগ্রহে অনেক সময় ও শ্রমের প্রয়োজন হয়ে থাকে। আর সে কারণে গবেষণালব্ধ ফলাফল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হয়।

৫. দ্বৈতীয়িক উৎস

আঞ্চলিক উপভাষা বিষয়ক বিভিন্ন প্রকাশিত অপ্রকাশিত প্রবন্ধ,নিবন্ধ, গ্রন্থ, রিপোর্ট, সেমিনার পত্র, সাহিত্যকর্ম এবং পত্র পত্রিকাসমূহ দ্বৈতীয়িক উৎস হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে প্রাথমিক উপাত্তের উপর অধিক গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। প্রাথমিক উপাত্ত সমূহ সরাসরি মাঠ পর্যায় থেকে সংগৃহীত। বক্ষ্যমাণ নিবন্ধে গফরগাঁও অঞ্চলে ব্যবহৃত জনগোষ্ঠীর ভাষার ধ্বনিতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ ও সংগৃহীত ভাষা নমুনা তথা শব্দের তালিকা উপস্থাপিত।

৬. গফরগাঁও উপভাষার ধ্বনিতত্ত্ব

একটি ভাষার ধ্বনিতত্ত্ব হলো বাগধ্বনির পদ্ধতি ও বিন্যাস (হক, ২০১৪)। স্বাভাবিকভাবে ভাষার ওপর ধ্বনির যে ভূমিকা তার গুরুত্ব অনুধাবনই ধ্বনিতত্ত্বের বিবেচ্য। এখানে ধ্বনি উৎপাদন, উচ্চারণ ও পরিবর্তনগত দিক সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়। ধ্বনিতত্ত্বের প্রধান তিনটি শাখার মধ্যে একটি উচ্চারণীয় ধ্বনিতত্ত্ব। যে শাখায় পৃথিবীর সকল ভাষার ধ্বনির উচ্চারণ বিষয়ক বর্ণনা প্রদান করা হয়ে থাকে। অর্থাৎ ধ্বনির অবস্থান, ধ্বনির পরিবর্তনের উপর গুরুত্ব দেয়া হয়ে থাকে (আসাদুজ্জামান, ২০১৬)। ধ্বনিতত্ত্বে পৃথিবীর প্রায় সকল ভাষার বাগধ্বনিকে প্রধানত দুই ভাগে ভাগ করা হয়। যেমন- স্বরধ্বনি ও ব্যঞ্জনধ্বনি। আঞ্চলিক ভাষার ধ্বনিসমূহ এর ব্যতিক্রম নয়। ফলে ধ্বনিতত্ত্বের আলোচনায় আমরা স্বরধ্বনি ও ব্যঞ্জনধ্বনির বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য তুলে ধরবো।

স্বরধ্বনি হল, যে সকল ধ্বনি উচ্চারণের সময় বাতাসের প্রবাহ স্বরপথের কোথাও বাধাগ্রস্ত না হয়ে উচ্চারিত হয়। অর্থাৎ স্বাভাবিক কথাবার্তায় গলনালী ও মুখবিবর দিয়ে বাতাস বেরিয়ে যাবার সময় কোন জায়গায় বাধা প্রাপ্ত না হয়ে কিংবা শ্রুতিগ্রাহ্য চাপ না খেয়ে ঘোষবৎ যে ধ্বনি উদগত হয় তাই স্বরধ্বনি। আর স্বাভাবিক কথাবার্তায় যেসব ধ্বনি এ তালিকায় পড়ে না তার সবগুলোই ব্যঞ্জনধ্বনি। স্বরধ্বনি বিশ্লেষণের জন্য মৌলিক স্বরধ্বনির পরিকল্পনা করা হয়েছে। একটি ভাষার স্বরধ্বনির মধ্যে জিহবার অবস্থান বিচার করে মৌলিক স্বরধ্বনি নির্ণয় করা হয়। এভাবে ৮টি মৌলিক স্বরধ্বনি পাওয়া যায় (হাই, ২০০৬)।

স্বরধ্বনি বিচারের মানদন্ডের ক্ষেত্রে সাধারণভাবে উচ্চারিত স্বরধ্বনিগুলোকে জিভের উচ্চতা-নিম্নতা, সম্মুখবর্তিতা-পশ্চাৎবর্তিতা, ঠোঁট ও চোয়ালের অবস্থান বিচারে সাজানো যায়। গফরগাঁয়ের আঞ্চলিক উপভাষায় জিহবার অবস্থান বিচার করে সাতটি মৌলিক স্বরধ্বনি পাওয়া যায়। যেমন: ই/ i (উচ্চ ও সম্মুখ স্বরধ্বনি), উ/ u (উচ্চ ও পশ্চাৎ), এ/ e (মধ্য ও সম্মুখ), ও/ o, অ/ ɔ (মধ্য ও পশ্চাৎ), অ্যা/ æ (নিম্ন ও সম্মুখ), আ/ a (নিম্ন ও পশ্চাৎ স্বরধ্বনি) প্রভৃতি।

প্রমিত বাংলা স্বরধ্বনির সঙ্গে আলোচ্য গফরগাঁও অঞ্চলের স্বরধ্বনির তুলনা দেখানো হল:

সারণি : ১ (সাক্ষাৎকার পর্বে উত্তরদাতাদের প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে)

বাংলা স্বরধ্বনি	IPA	গফরগাঁয়ের আঞ্চলিক রূপ	IPA	প্রমিত বাংলা
ই	i	ইন্দুর	/in̪dur/	ইঁদুর
এ	e	এফি	/epʰi/	এদিকে
অ্যা	æ	অ্যালাচি	/ælaci/	এলাচি
আ	a	আজাইর‍্যা	/ajaira/	অযথা
অ	ɔ	অততা	/ɔt̪ɔt̪a/	অনেক
ও	o	ওলদি	/old̪i/	হলুদ
উ	u	উফাইস্যা	/upʰaiʃʃa/	উপোসী

জিভের অবস্থান ও উচ্চতা নির্দেশপূর্বক প্রমিত বাংলা ও গফরগাঁয়ের আঞ্চলিক ভাষার উদাহরণে তুলনামূলক উপস্থাপনে স্বরধ্বনিসমূহ :

সারণি : ২ (সাক্ষাৎকার পর্বে উত্তরদাতাদের প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে)

স্বরধ্বনি	**বাংলা স্বরধ্বনি**	**বর্ণনা**	**প্রমিত বাংলা**	**আ.ধ্ব.ব**	**গফরগাঁয়ের আঞ্চলিক বাংলা**	**আ.ধ্ব.ব**
/i/	ই	সম্মুখ উচ্চ স্বরধ্বনি	কিল	/kil/	খিল	/kʰil/
/u/	উ	পশ্চাৎ উচ্চ স্বরধ্বনি	চুল	/cul/	খুল	/kʰul/
/e/	এ	সম্মুখউচ্চ মধ্য স্বরধ্বনি	তেল	/t̪el/	এফি	/epʰi/
/o/	ও	পশ্চাৎ মধ্য উচ্চ স্বরধ্বনি	তোলা	/t̪ola/	পোলা	/pola/

স্বরধ্বনি	বাংলা স্বরধ্বনি	বর্ণনা	প্রমিত বাংলা	আ.ধ্ব.ব	গফরগাঁয়ের আঞ্চলিক বাংলা	আ.ধ্ব.ব
/æ/	অ্যা	সম্মুখ নিম্ন মধ্য স্বরধ্বনি	অ্যাক	/æk/	অ্যাম্বাই	/æmbai/
/ ɔ /	অ	পশ্চাৎ নিম্ন মধ্য স্বরধ্বনি	বক	/bɔk/	অহনি	/ɔhɔni/
/a/	আ	নিম্ন স্বরধ্বনি	Pvj	/cal/	nvj	/hal/

৬.১ ধ্বনিগত পরিবর্তন

বিভিন্নভাবে ধ্বনি পরিবর্তিত হয়ে থাকে। কালক্রমে ভাষার মধ্যস্থ ধ্বনিসমূহ পরিবর্তিত হয়ে উপভাষার জন্ম হয়। ধ্বনি পরিবর্তনের বিভিন্ন কারণের মধ্যে রয়েছে মনস্তাত্ত্বিক কারণ, শারীরীয় কারণ, প্রাকৃতিক কারণ, ভৌগোলিক কারণ, সামাজিক কারণ প্রভৃতি। বাংলাদেশের প্রচুর সংখ্যক উপভাষার দিকে দৃষ্টিপাত করলেই আমরা বুঝতে পারি একটি ভাষা কত রকমভাবে পরিবর্তিত হয়ে উচ্চারিত হতে পারে। উপভাষা বৈচিত্র্যের অন্যতম প্রধান কারণ এই ধ্বনি পরিবর্তন। প্রমিত বাংলা ভাষায় ধ্বনি পরিবর্তন বেশ নিয়মিতভাবেই ঘটে থাকে। স্বর এবং ব্যঞ্জন উভয় শ্রেণির ধ্বনিই বিভিন্ন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে রূপান্তরিত হয়। যে কোন ভাষার ধ্বনি পরিবর্তন একটি স্বাভাবিক প্রক্রিয়া। দ্রুত উচ্চারণ করতে গিয়ে কিংবা অসাবধানতার কারণে অনেক সময় ধ্বনি পরিবর্তন ঘটতে পারে (হক, ২০১৪)। ধ্বনি পরিবর্তন ধ্বনিতাত্ত্বিক প্রক্রিয়ার ওপর প্রভাব ফেলে যার ফলে সম্পূর্ণভাবেই ধ্বনিতাত্ত্বিক পরিবর্তন হয়ে যায়। নিয়মিতভাবে পরিবর্তনকেই ধ্বনি পরিবর্তনের সূত্র বলা হয়। গফরগাঁও আঞ্চলিক উপভাষায় ধ্বনি পরিবর্তনের ক্ষেত্রেও এ বিষয়টি লক্ষণীয় ।

৬.১.১ গফরগাঁও অঞ্চলের উপভাষার স্বরধ্বনি পরিবর্তনের ধারা ও সূত্র

৬.১.১.১ অপিনিহিতি

ধ্বনি পরিবর্তনের একটি সাধারণ প্রক্রিয়া অপিনিহিতি। প্রথাগতভাবে শব্দের মধ্যস্থিত কিংবা অন্তস্থিত ই-কার অথবা উ-কার ত্যাগ করে কিংবা স্বস্থানে থেকেও যদি পূর্ববর্তী ব্যঞ্জনের পূর্বে আসীন হয় তবে তাকে অপিনিহিতি বলে চিহ্নিত করা হয় (সেলু বাসিত, ২০০৮)। পূর্ববাংলার ভাষা বৈশিষ্ট্যের একটা উল্লেখযোগ্য দিক অপিনিহিতি বা

ইপেনথিসিস। এই ধরনের পরিবর্তনে রূপমূলের মধ্যে অতিরিক্ত একটি স্বরধ্বনি সংযুক্ত হওয়া এবং শব্দের মধ্যে পরের /ই/ কার পূর্বে উচ্চারিত হওয়ার প্রবণতা থাকে। পবিত্র সরকার (২০০৬) বলেন, অপিনিহিতিপ্রবণ শব্দসমূহ সিলেবলের সংগঠন অনুযায়ী পরিবর্তিত হয়। অপিনিহিতিজাত ধ্বনি পরিবর্তন এ অঞ্চলের উপভাষায় পরিলক্ষিত হয়। যেমন: কঞ্চি >কইঞ্চা, কলিজা>কইলজা, কাল> কাইল, খেলা> খেইল, পদ্য> পইদ্দ, ভাগিনা> বাইগনা, রাখিয়া> রাইখ্যা ইত্যাদি।

৬.১.১.২ স্বরাগম

কোনো শব্দে ব্যঞ্জনের পূর্বে যদি স্বরধ্বনি যোগ হয় তাহলে তাকে স্বরাগম বলা হয়। স্বরাগম তিন ধরনের হয়ে থাকে।

আদি স্বরাগম

কোনো শব্দের শুরুতে যুক্তব্যঞ্জন যদি /স/ ধ্বনি থাকে তাহলে আদি স্বরাগম ঘটে থাকে। যেমন: স্পর্ধা > ইস্পর্দা, স্ত্রী>ইস্তিরি।

মধ্য স্বরাগম

যুক্ত ব্যঞ্জনে উচ্চারণ কষ্ট লাঘব করার জন্য উপভাষায় শব্দের মাঝখানে স্বরধ্বনি যোগ করা হয়। এভাবে শব্দের মাঝখানে স্বরধ্বনির আগমনকে মধ্য স্বরাগম বলা হয়। অনেক সময় যাকে বিপ্রকর্ষ বা স্বরভক্তি বলে। গফরগাঁয়ের উপভাষায় মধ্য স্বরাগমের ব্যবহার দেখা যায়। যেমন: গ্রাম > গেরাম, গ্যাস>গেলাস, রোদ> রইদ, চাল> চাইল।

অন্ত্য স্বরাগম

শব্দের শেষে যদি অতিরিক্ত স্বরধ্বনির আগমন ঘটে তবে তাকে অন্ত্য-স্বরাগম হিসাবে চিহ্নিত করা হয়। যেমন: পানসে –> পাইন্যা, দুনিয়া –> দুইন্যা, খুনি->খুইন্যা ইত্যাদি।

৬.২ স্বরসঙ্গতি

এক প্রকার স্বতন্ত্র ধ্বনি পরিবর্তন রূপে স্বরসঙ্গতির অবস্থান। রূপমূলের মধ্যে অনেকসময় শব্দের আদি বা মধ্যস্থিত স্বরধ্বনি শব্দের অন্য স্বরধ্বনির সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখার জন্য পূর্ববর্তী বা পরবর্তী স্বরধ্বনির মধ্যে সঙ্গতিমূলক পরিবর্তন ঘটায় (সেলু বাসিত,২০০৮)। উচ্চারণের সুবিধার জন্য শব্দের মধ্যে অবস্থিত বিভিন্ন প্রকার স্বরধ্বনির পাশাপাশি অবস্থান পরিবর্তন করে নেয়া হয়। আর এই ধ্বনিতাত্ত্বিক

প্রক্রিয়াকে বলা হয় স্বরসঙ্গতি। ব্লুমফিল্ডের(১৯৬৬) মত অনুযায়ী কয়েকটা স্বরধ্বনির সীমিত বিভাজন বিদ্যমান এবং এরা শ্রেণির রূপমূলের অভ্যন্তরস্থ পর্যায়ক্রমিক অক্ষরে বিশেষ কতগুলো স্বরধ্বনি অনুমোদন করে। একটি স্বরধ্বনির প্রভাবে আরেকটি স্বরধ্বনির পরিবর্তনকে স্বরসঙ্গতি বলা হয়। প্রমিত বাংলায় বিশেষ করে ভাষার চলিতরূপে এই পরিবর্তন লক্ষণীয়। চলিত ভাষার প্রভাবে উপভাষায়ও এই পরিবর্তন ঘটে থাকে। যেমন : খোলা> খুলা, গোলাপ> গুলাফ, ঘরে> গরঅ, চম্পা> চাম্পা, পোকা> পুকা, পেয়াজ> পিয়াইজ, বোন >বইন, মাস্টার> মাস্টর, তোর> তর, ভাল> বালা, নেশা> নিশা, লোহা> লুআ , লাটিম> লাডুম।

৬.২.১ স্বরধ্বনি লোপ

শব্দের কোন অংশ থেকে স্বর বা ব্যঞ্জন ধ্বনি কোন কারণে লোপ পেলে তাকে ধ্বনিলোপ বলা হয়। স্বরধ্বনির বিলুপ্তি ঘটলে তাকে স্বরধ্বনি লোপ বলা হয়। উপভাষায় বিভিন্ন ভাবে স্বরধ্বনি লুপ্ত হতে দেখা যায়। যেমন- কমবেশি> কমবেশ, জবাই> জব।

৬.৩ স্বরধ্বনিগত পরিবর্তন রীতি

গফরগাঁওয়ের আঞ্চলিক ভাষার সঙ্গে বাংলা রূপমূলের তুলনা করলে অনেক বৈসাদৃশ্য লক্ষ করা যায়। প্রমিত বাংলার বিভিন্ন ধ্বনি পরিবর্তিত হয়েই এ রূপভেদ সৃষ্টি হয়েছে।

সারণি ৬ : গফরগাঁও উপভাষার স্বরধ্বনিগত পরিবর্তন রীতি:

ধ্বনি পরিবর্তনের স্বরূপ	প্রমিত বাংলা		গফরগাঁয়ের উপভাষা	
	শব্দ	আ.ধ্ব.ব	শব্দ	আ.ধ্ব.ব
ই>অ	সিন্দুক	/ʃin̪duk/	সন্দুক	/ʃɔn̪duk/
ই>অ্যা	ইনি	/ini/	হ্যায়/হ্যাতে	/hæ/
ই>আ	চিবানো	/cibano/	চাবানো	/cabano/
উ>আ	উরু	/uru/	উরাত	/urat̪/
উ>ই	একুশ	/ekuʃ/	একুইশ	/ekuiʃ/
উ>এ	তুন্ন	/t̪unnɔ/	তেনা	/t̪æna/
উ>ও	তবু	/t̪obu/	তেও	/ t̪æo/

এ>ই	মেশিন	/meʃin/	মিশিং	/miʃiŋ/
এ >অ	সেমাই	/ʃemai/	সয়াই	/ʃɔai/
এ >ও	দাঁতে	/d̪at̪e/	দাতো	/d̪at̪o/
এ>আ	খেজুর	/k^{h}ejur/	খাজুর	/k^{h}ajur/
এ>অ্যা	জেলে	/jele/	জাউল্ল্যা	/jaullæ/
এ >উ	গেঞ্জি	/genji/	গুঞ্জি	/gunji/
এ >ঐ	আছেন	/asen/	আছইন	/asoin/
আ >এ	কাঁচি	/kãci/	কেনচি	/kenci/
আ>অ	রাবার	/rabar/	রফট	/rɔp^{h}ɔt/
আ>ই	বদনা	/bɔdna/	বদনি	/bɔdni/
আ>উ	মাগরেব	/magrib/	মুগরিব	/mugrib/
আ >অ্যা	কাঁথা	/kãt̪^{h}a/	খেতা	/k^{h}æt̪a/
অ >আ	মহাজন	/mɔhajɔn/	মাহাজন	/mahajɔn/
অ> উ	নখ	/nɔk^{h}/	নুক	/nuk/
অ >এ	খড়	/k^{h}ɔɾ/	খের	/k^{h}ær/
ও > অ	বোন	/ bon/	বইন	/boin/
ও >আ	ভালো	/b^{h}alo/	বালা	/bala/
ও >ই	মেটানো	/metano/	মিটানি	/mitani/
ও >উ	ওজন	/ojon/	উজন	/ujon/
ও >অ্যা	গেঁয়ো	/g̃eo/	গাইয়্যা	/gaiæ/

৬.৪ যৌগিক স্বরধ্বনি বা দ্বি-স্বরধ্বনি

যদি পাশাপাশি অবস্থিত দুটো সমশ্রেণির অথবা অসমশ্রেণির স্বরধ্বনি নিঃশ্বাসের একই প্রয়াসে উচ্চারিত হয়ে আক্ষরিক ধ্বনি গঠন করে এবং দ্বিতীয় স্বরধ্বনির তুলনায় প্রথমটা দীর্ঘ ও স্পষ্ট হয়, তাহলে এই শ্রেণীর আক্ষরিক স্বরধ্বনিকে দ্বি-স্বরধ্বনি বলা হয়। উচ্চারণগত দিক থেকে বলা যায় যে স্বরধ্বনি উচ্চারণের সময় জিহ্বা একই

অবস্থানে থাকে, তাকে বলা হয় একক স্বরধ্বনি বলে। আর যে স্বরধ্বনি উচ্চারণের সময় জিভের অবস্থান একক স্থানে না থেকে বিভিন্ন স্থানে সরে যায়, তাকে যৌগিক স্বরধ্বনি বলে গফরগাঁয়ের আঞ্চলিক উপভাষায় অসংখ্য যৌগিক স্বরধ্বনির ব্যবহার রয়েছে। যেমন: কিছু স্বাতন্ত্র্যসূচক যৌগিক স্বরধ্বনির উদাহরণ দেয়া হল।

গফরগাঁও-এর উপভাষায় স্বাতন্ত্র্যসূচক যৌগিক স্বরধ্বনি:

সারণি: ৪ (প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে)

ক্রমিক	যৌগিক স্বর		উদাহরণ		
	ধ্বনি চিহ্ন	আ.ধ্ব.ব	গ.উ	আ.ধ্ব.ব	প্র.বাং
১	এধা	/ea/	বেয়া	/bæa/	বিয়ে
২	ইধা	/ia/	ডাইয়া	/daia/	ঠান্ডা
৩	ওধা	/oa/	থোআ	/t̪ʰoa/	রেখে
৪	এএ	/eæ/	তেএ	/t̪eæ/	তাহলে
৫	অই	/ ɔi/	ছই	/sɔi̯/	ছাউনি

৬.৫ ধ্বনিমূল নির্ণয়

ক্ষুদ্রতম ভাষাতাত্ত্বিক উপাদানকে ধ্বনিমূল বলে। ধ্বনিগত দিক থেকে দুটো ধ্বনি সমশ্রেণির হলে এবং একই ধ্বনিতাত্ত্বিক পরিবেশে ব্যবহৃত হলে যদি একটি ধ্বনির পরিবর্তে অন্য একটি ধ্বনি বসার কারণে অর্থগত পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়, তাহলে সেই দুটো ধ্বনি আলাদা আলাদা ধ্বনি হিসেবে চিহ্নিত হবে (হক, ২০১৪)। কোনো ভাষার ধ্বনিমূল নির্ণয়ের একটি সাধারণ পদ্ধতি আছে। তাকে বলা হয় প্রতিস্থাপন পদ্ধতি। কোনো শব্দের মধ্যে অন্য সকল ধ্বনি অপরিবর্তিত রেখে একটি নির্দিষ্ট ধ্বনির স্থানে আর একটি ধ্বনি বসালে যদি অর্থের পরিবর্তন ঘটে তাহলে অর্থের পার্থক্য সৃষ্টিকারী সেই ধ্বনি দুটোকে ধ্বনিমূল বলা হবে (হক, ২০১৪)। আবার শব্দজোড় পদ্ধতিতেও ধ্বনিমূল নির্ণয় সম্ভব। সেক্ষেত্রে দুটো শব্দরূপের এক স্থানে একটি ধ্বনিই পৃথক হবে আর বাকি সব অভিন্ন। এরকম দুটো শব্দরূপকে একত্রে বলা হবে শব্দজোড়। প্রায় সমুচ্চারিত শব্দ মিলেও এটা হতে পারে। প্রতিটা ভাষাতেই চেষ্টা করলে শব্দজোড় দিয়ে সে ভাষার ধ্বনিমূল চিহ্নিত করা সম্ভব। বাংলা উপভাষাতেও শব্দজোড় পদ্ধতির সাহায্যে প্রকৃত ধ্বনিমূল দেখানো যায়।

ধ্বনিমূল নির্ণয়ের প্রকৃত বিবেচনা হওয়া উচিত- দুটি ভিন্ন শব্দরূপের পার্থক্য এবং অর্থের পরিবর্তন ঘটে কিনা তা লক্ষ্য করা।

আলোচ্য গফরগাঁও অঞ্চলের উপভাষায় প্রাপ্ত ২৬টি ব্যঞ্জনধ্বনিরূপের ন্যূনতম সংখ্যাজোড় নিম্নরূপ:

সারণি ৫ : ব্যঞ্জন ধ্বনিরূপের ন্যূনতম সংখ্যাজোড়

ক্রম	গফরগাঁয়ের উপভাষায় ব্যবহৃত শব্দ	প্রমিত বাংলা শব্দ	ক্রম	গফরগাঁয়ের উপভাষায় ব্যবহৃত শব্দ	প্রমিত বাংলা শব্দ
১./ক/	কাইল	কাল		পেক	কাদা
	কাজিয়া	ঝগড়া	১৪./ফ/	ফালি	টুকরা
	কাউয়া	কাক		ফালায়া	ফেলে
২./খ/	খাউজ	চর্মরোগ	১৫./ব/	বগা	বক
	খালুই	মাছ ধরার পাত্র	১৬./ম/	মাইন্যা	মেনে
	খাইট্ট্যা	খেটে		মাইজলা	মেঝো
৩./গ/	গারি	গাড়ি	১৭./ন/	নাই	নাভি
	গরি	ঘড়ি		নালি	নল
	গফরগাঁও	গহরগাঁও	১৮./র/	রইদ	রোদ
৪./চ/	চাইল	চাল		রাইত	রাত
	চালু	দ্রুত	১৯./ল/	লাডি	লাঠি
	চারি	পাত্র বিশেষ	২০./স/	সালাম	সালাম
৫./ছ/	ছুলি	রোগ		সালুন	ব্যঞ্জন
	ছেপ	থুতু	২১./য/	বাইয্যা	আটকে
৬/জ/	জুয়া	জুয়া		হাইয্যা	সাজা
	জব	জবাই	২২./শ/	শইল	শরীর
	জালি	জাল		শরম	লজ্জা

৭./ট/	ট্যাহা	টাকা	২৩./ড়/	আড়	বাঁশের তার
	ট্যাটনা	চালাক		আশাড়	আষাঢ়
৮./ঠ/	ঠাট্টা	তামাশা	২৪./য়/	আয়ু	হায়াত
	ঠাডা	বজ্রপাত		আয়ো	এসো
৯./ড/	ডাইল	ডাল	২৫./হ/	হাপ	সাপ
১০./ত/	ততা	গরম		হাক	শাক
	তবন	লুঙ্গি	২৬./ঙ/ং/	গাঙ	নদী
১১./থ/	থালি	থালা		জাঙলা	পাতলা খড়ি
	থইল্লা	থলে			
১২./দ/	দাই	ধাত্রী			
	দান	আন			
১৩./প/	পাক	পবিত্র			

৬.৬ যুগ্মীভবন

যুগ্মীভবনের ক্ষেত্রে সমশ্রেণির দুটো ব্যঞ্জনধ্বনি পরস্পর অবস্থান করে। সমশ্রেণির পরস্পর দুটো ব্যঞ্জনের এক প্রয়াসে নয় তবে একত্রে উচ্চারিত হওয়াকে যুগ্মীভবন বলে। সমশ্রেণির ব্যঞ্জনধ্বনির ক্ষেত্রে লক্ষণীয়, দ্বি-স্বরধ্বনির মতো এখানে প্রথম ব্যঞ্জনধ্বনিটি দ্বিতীয় ব্যঞ্জনধ্বনির তুলনায় উচ্চ বা দীর্ঘ হয় (মোরশেদ,২০০৯)। সমশ্রেণির ধ্বনি দ্বারা গঠিত যুগ্মীভবনে শ্বাসপর্ব থাকে। যুগ্মীভবনের এরকম প্রকৃতিতে গফরগাঁও অঞ্চলের উপভাষায় বিভিন্ন বৈচিত্র্য পরিলক্ষিত হয়।

ক. সংযুক্ত ব্যঞ্জনের ক্ষেত্রে: রক্ষা- রক্কা, যক্ষা-যক্কা, সপ্তা- হফ্তা,ডিম- আন্ডা ইত্যাদি।

খ. সমশ্রেণির ব্যঞ্জনের সংযুক্তির মাধ্যমে যুগ্মীভবন গঠিত হয়: যেমন: আচ্ছা> আইচ্চা, উনিশ->উন্নিশ, কুমির->কুম্মুর, ঘৃণা> গিন্না, জুমা> জুম্মা, চড়> থাপ্পর, মাতবর> মাতব্বর, পৃথিবী>-দুইন্না, কবর->কব্বর, সকালে-> বেইন্না, কোমর->কম্মর, হাতি> আত্তি ইত্যাদি।

৬.৭ ব্যঞ্জন বিকৃতি

কখনোও কখনোও ব্যঞ্জন পরিবর্তিত হয়ে নতুন ব্যঞ্জনের আবির্ভাব ঘটলে ব্যঞ্জন বিকৃতি ঘটতে পারে। যেমন: কেঁচো->জির, ছারপোকা->উরস, সবুজ->কচ্চুয়া, পানসে->পাইনস্যা।

নিম্নে গফরগাঁও অঞ্চলের উপভাষার ব্যঞ্জনধ্বনি বৈচিত্র্য তুলে ধরা হল:

সারণি ৭ : আদি মধ্য ও অন্ত্য অবস্থানে গফরগাঁও উপভাষার ব্যঞ্জনধ্বনি

ধ্বনিচিহ্ন	আদ্য অবস্থান		মধ্য অবস্থান		অন্ত্য অবস্থান	
	আঞ্চলিক শব্দ	প্রমিত বাংলা	আঞ্চলিক শব্দ	প্রমিত বাংলা	আঞ্চলিক শব্দ	প্রমিত বাংলা
ক্	কাহই	চিরুনি	চুকলা	খোসা	পেক	কাদা
খ্	খে'শ	কুটুম	পাখনা	ডানা	উখ	আখ
গ্	গুবর	গোবর	বগা	বক	হাগ	শাক
চ্	চালায়া	দ্রুত	কচ্চওয়্যা	সবুজ	হাচা	সত্য
ছ্	ছেম্‌রা	ছেলে	বিছ্‌রা	ক্ষেত	খাছ্	খাঁটি
জ্	জির	কেঁচো	কাইজ্জা	ঝসড়া	কবজা	আয়ত্ত
ট্	টেডন	চালাক	খাইষ্টা	খারাপ	মুট	মুষ্ঠি
ঠ্	ঠসা	কানে খাট	-	-	-	-
ড্	ডর	ভয়	খাডা	খাট(ছোট)	খাড্	খাট
ত্	তবন	লুঙ্গি	আত্‌কা	হঠাৎ	আত্	নাড়ী
থ্	থৌরা	মোচা	পাতথর	পাথর	লাথ	লাথি
দ্	দম্‌ফুডা	আবদ্ধ	আদম	মানুষ	হাদ	সাধা
প্	পুইচ্ছা	মুছে	থাপ্পর	চড়	হাপ	সাপ

ফ্	ফাশ	ফাঁসি	উফাস	উপবাস	লাফ	লম্ফ
ব্	বইন	বোন	কব্বর	কবর	গাব	ফল
ঙ/ং	-		চং	মই	গাঙ	নদী
ন্	নেউল	বেজি	কানা	অন্ধ	হান	ইট
ম্	মেমান	অতিথি	আমতা	ইতস্তত	কাম	কাজ
য্	যিদ	জেদ	পাযি	দুষ্ট	হায	মেঘ
র্	রইদ	রোদ	খরি	লাকড়ি	উসার্	মাচা
ড়	-	-	বড়ি	ট্যাবলেট	আড়	বাঁশের তার
ল্	লুন্দি	মেদ	পলা	কুচি	নহল	নকল
শ্	শইল	শরীর	মৈশাল	মহিষ পালক	খবিশ	খারাপ
স্	সাফ	পরিষ্কার	হাছা	সত্য	খাছ	খাঁটি
য়	-	-	ডাইয়া	ঠাণ্ডা	খয়	নষ্ট
হ্	হাইন্জ্যা	সন্ধ্যা	আহেরি	আখেরি	পাহা	পাকা

ভাষাগত বৈচিত্র্যই উপভাষা। বাংলাদেশ ভাষা বৈচিত্র্যে সমৃদ্ধ। সমগ্র বাংলাদেশের ব্যতিক্রমী উপভাষা অঞ্চল হিসেবে ময়মনসিংহ জেলার গুরুত্ব ও গ্রহণযোগ্যতা সর্বজনীন। আবহমান কাল থেকে পূর্ববঙ্গ অঞ্চলের জনপদ নিরাপদ বেষ্টনীর মধ্যে অবস্থান করছে। বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর প্রভাব, পারস্পরিক সহাবস্থানে ভাষার সংকরায়ন ঘটার অবকাশ এখানে তেমন নেই। দীর্ঘ সময়ের পথ পরিক্রমায় ভাষার স্বভাবসুলভ পরিবর্তন রীতিতে উপভাষা তার নিজস্ব রূপ লাভ করেছে। ধ্বনিতাত্ত্বিক, রূপতাত্ত্বিক ও বাক্যতাত্ত্বিক পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে এই পরিবর্তনগুলো ঘটে থাকে। এ গবেষণায় শুধু ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যসমূহ বিশ্লেষণ করা হয়েছে। প্রমিত ভাষারূপের নিকটবর্তী এ উপভাষার বাকপ্রবাহ ও ধ্বনিবৈচিত্র্যে বিভিন্ন ব্যতিক্রম পরিলক্ষিত হয়। উপভাষাটির প্রধান বৈশিষ্ট্য ধ্বনির অবস্থানগত ও ধ্বনির উচ্চারণ বৈচিত্র্যে। ধ্বনিগত পরিবর্তনের দিকটি এখানে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। গফরগাঁওয়ের আঞ্চলিক উপভাষার উচ্চারণ বৈচিত্র্য থেকে প্রাপ্ত অধিক প্রচলিত ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যগুলো নিম্ন রূপ :

- এ অঞ্চলের উপভাষায় প্রমিত বাংলার /এ/ স্বরধ্বনি প্রায়শই /অ্যা/ রূপে উচ্চারিত হয়। যেমন: দেশ- দ্যাশ, দেখে- দ্যাখে, লেপ- ল্যাপা, মেলা- ম্যালা, একি- অ্যাকি, ছেঁকে -ছ্যাহা, কে- ক্যাডা প্রভৃতি।
- প্রমিত বাংলার /আ/ স্বরধ্বনি কখনো /অ্যা/ রূপে উচ্চারিত হয়। যেমন: কাঁথা- খ্যাতা, বাঁকা- ব্যাহা, টাকা- ট্যাহা প্রভৃতি।
- এ অঞ্চলের উপভাষায় স্বরধ্বনি /ও/ কখনো পরিণত হয় /উ/ এবং /অ/ ধ্বনিতে। যেমন : বোল – বল, চোর – চুর, কোথায় – কুথায়, খোল – খুল, জোড়া – যুরা, জ্যোঁক – জুক ইত্যাদি।
- এ অঞ্চলের বাংলায় আনুনাসিক ধ্বনির ব্যবহার খুব কম। প্রায় ক্ষেত্রেই আনুনাসিক ধ্বনির উচ্চারণ পরিবর্তিত হয়ে যায়।
- এছাড়াও /ক, /খ, /শ, /স/ ব্যঞ্জনধ্বনিসমূহ অনেক ক্ষেত্রে পরিবর্তিত হয়ে কণ্ঠনালীয় ধ্বনি /হ/ রূপে উচ্চারিত হয়ে থাকে।
- অনেক শব্দে /হ/ ধ্বনি পরিবর্তিত হয়ে স্বরধ্বনি /অ/ রূপে উচ্চারিত হওয়ার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়।
- এছাড়াও ব্যতিক্রমী কিছু বিভক্তি, প্রত্যয়, বচন, সর্বনাম, ক্রিয়ারূপ, প্রবাদ-প্রবচন, বাগধারা এ উপভাষার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য।
- অন্যান্য উপভাষার সাধারণ বৈশিষ্ট্য যেমন- ঘোষ ও মহাপ্রাণ ধ্বনির ব্যবহার লক্ষ্য করা যায় না।
- এ উপভাষাতে দীর্ঘ ক্রিয়ারূপমূলের ব্যবহারও একটি উল্লেখযোগ্য দিক।

৭. উপসংহার

উপর্যুক্ত আলোচনা, উপাত্ত উপস্থাপন ও বিশ্লেষণ, গভীর পর্যবেক্ষণ ও যুক্তি প্রমাণ সাপেক্ষে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে স্বতন্ত্র প্রাতিস্বিক বৈচিত্র্যে সমুজ্জ্বল এ উপভাষা প্রমিত ভাষারূপের নিকটবর্তী । এ উপভাষার বাকপ্রবাহ ও ধ্বনিবৈচিত্র্য এবং বিভিন্ন গবেষণালব্ধ প্রাপ্ত ফলাফল নিরীক্ষণান্তে বলা যায় গফরগাঁওয়ের আঞ্চলিক উপভাষার রয়েছে নিজস্ব ঔপভাষিক বৈশিষ্ট্য ও স্বতন্ত্র রূপমূল ভান্ডার। প্রমিত বাংলাভাষার সঙ্গে অনেক ক্ষেত্রেই সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। যেমন : স্বরধ্বনি, ব্যঞ্জনধ্বনি, যৌগিক স্বরধ্বনি, রূপমূল, পদ, শব্দ, বিভক্তি, সর্বনামের ব্যবহারে, প্রত্যয়, বচন,কাল বিবিধ ক্ষেত্রে এই উপভাষার স্বাতন্ত্র্য বিদ্যমান। শব্দ বৈচিত্র্য ও উচ্চারণ মাধুর্যে খুব সহজেই একে অন্যান্য উপভাষা থেকে পৃথক করা যায়। ঢাকা জেলার নিকটবর্তী অঞ্চলে অবস্থানের পরিপ্রেক্ষিতে এবং প্রভাবে

উপভাষাটির গঠন বৈশিষ্ট্য সকলের বোধগম্য। উপভাষাচর্চা, উপভাষা সংরক্ষণ, উপভাষায় সাহিত্য রচনা আজ প্রায়োগিক ভাষাবিজ্ঞানের এক উন্মুক্ত ক্ষেত্র। ভাষাবিজ্ঞানের ইতিহাসে উপভাষা গবেষণার গুরুত্ব ও তাৎপর্য অনুধাবনে এবং নতুন প্রজন্মকে উৎসাহ প্রদানের ক্ষেত্রে বর্তমান প্রবন্ধ একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন।

তথ্যনির্দেশ

আসাদুজ্জামান, মুহাম্মদ। ২০১৬। *ধ্বনিবিজ্ঞান ও ভাষাতত্ত্ব*। ঢাকা: বুকস ফেয়ার।

ইসলাম, রফিকুল । ১৯৯৮। *ভাষাতাত্ত্বিক প্রবন্ধাবলী*। ঢাকা : বাংলা একাডেমী।

ইয়াসমীন, ফিরোজা। ২০১০। *ঢাকাই উপভাষা: প্রবাদ-প্রবচন, ছড়া ও কৌতুক*। ঢাকা: বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি।

করিম, মো আশ্রাফুল। ২০০৯। *সিলেটের চা শ্রমিকদের ভাষা: একটি ধ্বনিতাত্ত্বিক সমীক্ষণ*: *The Dhaka University Journal of Linguistics;* Vol-2, No-4, August 2009.

চট্টোপাধ্যায়, সুনীতিকুমার। ১৯৮৯। *ভাষা প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ*। কলকাতা: রূপা এ্যান্ড কোং।

মনিরুজ্জামান । ১৯৯৪। *উপভাষা চর্চার ভূমিকা*। ঢাকা : বাংলা একাডেমী।

মজুমদার, শ্রী কেদারনাথ । ১৯০৭। *ময়মনসিংহের ইতিহাস ও ময়মনসিংহের বিবরণ*। ঢাকা : আনন্দধারা।

মোরশেদ, আবুল কালাম মনজুর। ২০০৯। *আধুনিক ভাষাতত্ত্ব*। ৬ষ্ঠ সংস্করণ, ঢাকা : মাওলা ব্রাদার্স।

মোরশেদ, আবুল কালাম মনজুর সম্পাদিত। ২০০৭। *ভাষা ও সাহিত্য : বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক সমীক্ষামালা*-৬। ঢাকা : বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি।

রহিম ও আসাদুজ্জামান, আব্দুর, মুহাম্মদ। ২০০৭। *সিলেটের উপভাষা*। ঢাকা: বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, Vol-6.

সরকার, পবিত্র। ২০০৬। *বাংলা ব্যাকরণ প্রসঙ্গ*। কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং।

সেন, সুকুমার। ১৯৭১। *ভাষার ইতিবৃত্ত*। কলকাতা : ইস্টার্ন পাবলিশার্স।

সেলু বাসিত, নূর-ই-ইসলাম। ২০০৮ *সিলেটের উপভাষা সাংগঠনিক বিশ্লেষণ*। ঢাকা : বাংলা একাডেমী।

সাত্তার, মুহাম্মদ আব্দুস । ২০০৪। *বৃহত্তর ময়মনসিংহের লোকসাহিত্য ও সংস্কৃতি*। ঢাকা : বইপত্র।

হক, মহাম্মদ দানীউল । ২০১৪। *ভাষাবিজ্ঞানের কথা*। ঢাকা : মাওলা ব্রাদার্স।

হাই, মুহম্মদ আবদুল । ২০০৬। *ধ্বনিবিজ্ঞান ও বাংলা ধ্বনিতত্ত্ব*। নবম সংস্করণ, ঢাকা: মল্লিক ব্রাদার্স।

শহীদুল্লাহ্, মুহম্মদ । ১৯৬৫। *বাঙ্গালা ভাষার ইতিবৃত্ত*। ঢাকা: বাংলা একাডেমী।

Chambers, J.K.,Trudgill, P. (1998). *Dialectology*.Cambridge: Cambridge University Press.

L. Bloomfield.(1935), *Language*,London.

Yule, George (2010) : *The Study of Language* ; 4th ed., Cambridge University Press,UK.

https://www.ethnologue.com/country/bd/languages

পরিশিষ্ট

তথ্যদাতাদের পরিচয় :

(ক) নাম-আবদুল মতিন, লিঙ্গ-পুরুষ, বয়স-৬৫, শিক্ষাগত যোগ্যতা-অশিক্ষিত, পেশা-নার্সারি ব্যবসা, বাসস্থান-সালটিয়া ইউনিয়ন, গফরগাঁও।

(খ) নাম-ফতের মা, লিঙ্গ-মহিলা,বয়স-৪৫, শিক্ষাগত যোগ্যতা-নিরক্ষর, পেশা- ভিক্ষুক, বাসস্থান-গ্রাম-রাওনা, গফরগাঁও।

(গ) নাম-ফজিলা, লিঙ্গ-মহিলা, বয়স-৪২, শিক্ষাগত যোগ্যতা-নিরক্ষর, পেশা-গৃহকর্মী, বাসস্থান-গ্রাম-হাটুরিয়া, গফরগাঁও।

(ঘ) নাম-শিরিনা বেগম, লিঙ্গ-মহিলা, বয়স-৪৫, শিক্ষাগত যোগ্যতা-নিরক্ষর, পেশা- ভিক্ষুক, বাসস্থান : গ্রাম-পাঁচুয়া, গফরগাঁও।

(ঙ) নাম- রহিমা আক্তার, লিঙ্গ-মহিলা, বয়স-৪০, শিক্ষাগত যোগ্যতা-নাম স্বাক্ষর করা, পেশা- গৃহকর্মী, বাসস্থান : গ্রাম-পাচঁবাগ।

(চ) নাম- আব্দুল মজিদ, লিঙ্গ-পুরুষ, বয়স-৫৫, শিক্ষাগত যোগ্যতা-অল্প শিক্ষিত, পেশা-নাইট গার্ড, বাসস্থান : গ্রাম-রৌহা।

(ছ) নাম-আব্দুল হাশেম, লিঙ্গ-পুরুষ, বয়স-৫৬, শিক্ষাগত যোগ্যতা-৮ম শ্রেণি, পেশা- কৃষিকাজ, বাসস্থান : গ্রাম-রৌহা।

(জ) নাম- হাজেরা খাতুন, লিঙ্গ-মহিলা, বয়স-৫০, শিক্ষাগত যোগ্যতা-৫ম শ্রেণি, পেশা-গৃহিনী, বাসস্থান : গ্রাম-ভারইল।

(ঝ) নাম-মো. ছমিরউদ্দিন, লিঙ্গ- পুরুষ, বয়স-৫৫, শিক্ষাগত যোগ্যতা-অল্প শিক্ষিত, পেশা-দুধ বিক্রেতা, বাসস্থান : গ্রাম-গন্ডগ্রাম।

(ঞ) নাম-আছমা খাতুন, লিঙ্গ-মহিলা, বয়স- ৪৫, শিক্ষাগত যোগ্যতা-৫ম শ্রেণি, পেশা-পরিচ্ছন্নতা কর্মী, বাসস্থান : গ্রাম-গফরগাঁও সদর।

(ট) নাম- আরতি সূত্রধর, লিঙ্গ-মহিলা, বয়স-৪৭, শিক্ষাগত যোগ্যতা- অল্প শিক্ষিত, পেশা-পরিচ্ছন্নতা কর্মী, বাসস্থান : গফরগাঁও সদর।

(ঠ) নাম-রাঁধা পাল, লিঙ্গ-মহিলা, বয়স-৪৬, শিক্ষাগত যোগ্যতা-নিরক্ষর, পেশা- জেলেনী, বাসস্থান : গ্রাম-ষোলহাসিয়া, সালটিয়া ইউনিয়ন।

(ড) নাম-অর্চনা রানী, লিঙ্গ-মহিলা, বয়স-৪৫, শিক্ষাগত যোগ্যতা-নিরক্ষর, পেশা- জেলেনী, বাসস্থান : গ্রাম-ষোলহাসিয়া, সালটিয়া ইউনিয়ন।

(ঢ) নাম- ওয়াইযুদ্দিন, লিঙ্গ-পুরুষ, বয়স-৫০, শিক্ষাগত যোগ্যতা-অল্পশিক্ষিত, পেশা-বালু বিক্রি, বাসস্থান : গ্রাম-বিশ্বরোড, গফরগাঁও সদর।

(ণ) নাম- গোলাম মুর্শিদ, লিঙ্গ-পুরুষ, বয়স-৫০, পেশা-কৃষক, শিক্ষাগত যোগ্যতা- নিরক্ষর, বাসস্থান : গ্রাম-শিলাশি, গফরগাঁও।

(ত) নাম- আবদুস সালাম, লিঙ্গ-পুরুষ, বয়স-৫২, পেশা- রিকশাওয়ালা, শিক্ষাগত যোগ্যতা-নিরক্ষর, বাসস্থান : গ্রাম-লংগাইর।

(থ) নাম-কালু ব্যাপারী, পেশা-ছালার কারবারী, বয়স-৫০, লিঙ্গ-পুরুষ, শিক্ষাগত যোগ্যতা- অল্প শিক্ষিত, বাসস্থান : গ্রাম-ভারইল, গফরগাঁও।

(দ) নাম-বকুলা, পেশা-ভিক্ষাবৃত্তি, বয়স-৬০, লিঙ্গ-মহিলা, শিক্ষাগত যোগ্যতা-নিরক্ষর, বাসস্থান : গ্রাম-জয়ার চর, গফরগাঁও।

(ধ) নাম-মো. আইনুদ্দি, পেশা-কৃষিজীবী, বয়স-৬২, লিঙ্গ-পুরুষ, শিক্ষাগত যোগ্যতা-অল্প শিক্ষিত, বাসস্থান : গ্রাম-পুখুরিয়া, গফরগাঁও।

(ন) নাম- মো. গেয়াসউদ্দিন, পেশা-রিকশাওয়ালা, বয়স-৪৫, লিঙ্গ-পুরুষ, শিক্ষাগত যোগ্যতা-৫ম শ্রেণি পাশ, বাসস্থান : গ্রাম-হাটুরিয়া।